Vol. 52 | No. 3 | 2015

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

Volume	52
Issue	3
Year	2015
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Hosne Ara
Published online	June 1, 2015
DOI	10.62328/sp.v52i3.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v52i3.3
Pages	53-67
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

Check for updates

হোসনে আরা*

সৃষ্টিশীল প্রতিভা সমাজ ও সমকাল থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে নয়, সংশ্লিষ্ট থেকেই পূর্ণতা পায়। আধুনিক বাংলা সাহিত্য প্রথমাবধি বাস্তবতার ভূমিতে শেকড় বিস্তার করে বেড়ে উঠেছে। বিশেষত বাংলা কথাসাহিত্যের দিকনির্দেশকরা জীবনঘনিষ্ঠ রচনাতে স্বচ্ছন্দ থেকেছেন পূর্বাপর। ওই ধারার সফল উত্তরসূরি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) সস্তা ভাবালুতা বর্জন করে আমৃত্যু স্বদেশ-স্বসমাজের মানুষের জীবন বিশেষত সংগ্রামী জীবনকে উপজীব্য করে সাহিত্য রচনা করেছেন। মার্কসবাদে দীক্ষিত এ সাহিত্যিক ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণ, কঠোর যুক্তিবাদ, সংস্কারমুক্ত ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগে বাংলা কথাসাহিত্যে স্বতন্ত্র অথচ স্থায়ী আসন অধিকার করেছিলেন অনায়াস দক্ষতায়। তাঁর কথাসাহিত্যে সমকালীন সমাজ ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষিত হয়ে বহুকৌণিক মাত্রিকতায় উদ্ভাসিত হয়েছে।

ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে ১৯৪৬-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এক মর্মান্তিক ও লজ্জাজনক ঘটনা। জাতিগত পরিচয়কে গৌণ করে ধর্মীয় পরিচয়কে প্রাধান্য দেবার মানসিকতা এবং মুখ্যত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের ইন্ধনে কিছু সুযোগসন্ধানী অর্থলোলুপ লোকের দ্বারা এদেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে দেয়া ধর্মীয় বিভেদের প্রত্যক্ষ ফলই এই দাঙ্গা। চতুর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী নিজেদের প্রভাব এবং বাজার স্থায়ীকরণে অখণ্ড বাংলার বিভাজনকে সুনিশ্চিত করতে পরিকল্পিতভাবে স্বাধীনতার ঠিক একবছর পূর্বে ভ্রাতৃঘাতী সংঘাতের আয়োজন করে। শাসকগোষ্ঠীর এই পরিকল্পনা এবং মানবতার চরম অবমাননাকর পরিস্থিতির পটভূমিতে এ উপমহাদেশের মানবতাবাদী সাহিত্যিকগণ কলম ধরতে বাধ্য হয়েছেন — কৃষণ চন্দর উর্দু ভাষায় রচনা করেছেন *গাদ্দার*, বাংলা ভাষায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন সুদীর্ঘ উপন্যাস *স্বাধীনতার স্বাদ* (১৯৫১), এবং বেশ কিছু ছোটগল্প — খতিয়ান (*খতিয়ান*), ভালবাসা (*ছোটবড়*), ছেলেমানুষি (*ছোটবড়*) এবং স্থানে ও স্তানে (*ছোটবড়*) প্রভৃতি।

১৯৪৬-এর ১৬ আগস্ট থেকে তিনদিনব্যাপী যে পৈশাচিক তাণ্ডব চলে কলকাতা শহরজুড়ে তাতে সরকারি হিসেবেই নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় সাড়ে তিন হাজার এবং আহত সাড়ে চার হাজার। দেড়লক্ষ লোকের শহরত্যাগ ও নব্বই হাজার মানুষের দুস্থ হওয়ার ঘটনা ঘটে। (অমলেন্দু, ১৯৮৯ : ১৯৭) সাম্প্রদায়িক বিভীষিকার এই ভয়ালরূপ কেবল কলকাতাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না — ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্র ভারতবর্ষে। কলকাতার (১৬-১৮ আগস্ট) পরে বোম্বে (১ সেপ্টেম্বর), নোয়াখালি (১০ অক্টোবর), বিহার(২৫ অক্টোবর),গড় মুক্তেশ্বর (নভেম্বর) ও পাঞ্জাব (মার্চ ১৯৪৭)সহ সমগ্র দেশে এই সংঘাত ছড়িয়ে পড়ে এবং

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আনুমানিক এক লক্ষ আশি হাজার লোক প্রাণ হারায়। এই নিষ্ঠুরতম হত্যাযজ্ঞ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বেদনাহত করেছিল। দাঙ্গা প্রতিরোধে বা শান্তি স্থাপনে সক্রিয়ভাবে মৃত্যুভয় উপেক্ষা করে তিনি কলকাতার রাস্তায় নেমেছেন এবং একজন কমিউনিস্ট হিসেবে হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের সন্দেহভাজন হয়ে প্রাণনাশের হুমকি পর্যন্ত পেয়েছেন, তবু পিছু হটেননি। তাছাড়া একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে এই সংঘাতের পেছনে শাসকগোষ্ঠীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্পর্কেও সাধারণকে জানাতে চেয়েছেন তিনি। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধিতেই রচনা করেছেন *স্বাধীনতার স্বাদ* উপন্যাসটি। এ উপন্যাসে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বীভৎস বর্ণনা প্রকট নয়, বরং বিভীষিকায় বিমূঢ় স্বতন্ত্র মানুষের মনোলোক অবলোকন এবং সেই সঙ্গে একজন বামপন্থি রাজনৈতিক কর্মীর দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ ঘটনার বিশ্লেষণ প্রাধান্য পেয়েছে।

১৯৪৬-এর ১৬ থেকে ১৮ আগস্ট তিনদিনব্যাপী কলকাতায় যে নৃশংস ধর্মোন্মাদনায় অসংখ্য প্রাণহানি এবং বিভীষিকার সৃষ্টি হয়, সেই পটভূমিতে রচিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *স্বাধীনতার স্বাদ* উপন্যাসটি। তবে সুদীর্ঘ এ উপন্যাসের কাহিনিকাল কেবল ওই তিনদিনই নয়, বরং ১৯৪৭-এর 'স্বাধীনতা দিবসের দিন তিনেক আগে' পর্যন্ত বিস্তৃত। এই বৎসরাধিক কাল কলকাতা নগরবাসী যে আতঙ্ক, অস্বস্তি এবং সংঘাতের মধ্যে দিন কাটিয়েছে তারই চালচিত্র অঙ্কন করেছেন ঔপন্যাসিক কিছু ঘটনা ও চরিত্রের কথোপকথন ও মানসিক চিন্তার বয়নে। বস্তুত, পুরো বছর জুড়েই কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা বিরাজ করছিল, সুযোগসন্ধানী লোকেরা বিভিন্নভাবে সাম্প্রদায়িক জিঘাংসা উস্কে নতুন করে এলাকাভিত্তিক দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টায় ছিল এবং কিছু ক্ষেত্রে সফল হয়েছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু এলাকায় মুসলমান পরিবারের বসবাস বা প্রবেশ যেমন অঘোষিতভাবে নিষিদ্ধ হয়ে পড়েছিল, তেমনি মুসলমান পাড়াতেও হিন্দুরা নিরাপদ ছিল না। এ উপন্যাসে তাই প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মী প্রণবের বাড়িতে কলকাতার বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রাণ বাঁচাতে আশ্রয় নিয়েছে দাঙ্গাবিধ্বস্ত পাঁচ-ছটি পরিবার। এই পরিবারের সদস্যদের ভাবনা ও ক্রিয়াকলাপ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চালিকাশক্তি হলেও এদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বুড়ো নানি ও তার পরিবার এবং সেইসূত্রে বস্তির অন্যান্য পরিবারের ভাবনা, কবি মনসুর ও তার স্ত্রী রশৌনা, পত্রিকা অফিস, রেশনের দোকান, শুঁড়িখানা, চোরাকারবারের গুদাম এবং রাজনৈতিক সভা-শোভাযাত্রার বর্ণনায় কলকাতার দাঙ্গার আবহ ও ধ্বংসলীলা বাস্তবরূপ লাভ করেছে।

দাঙ্গার ভয়াবহতা মধ্যবিত্ত পরিবারের মন-মানসকে স্থবির করে দিয়েছে। আত্মরক্ষার ভাবনায় মানবিকতার বাষ্পটুকুও উবে গেছে। টেলিগ্রাম পেয়ে মণিমালাদের রক্ষার্থে যখন তার মামা প্রমথ সুদূর মধ্যভারত থেকে ছুটে এসে তাদেরই বাড়ির সামনে দাঙ্গাকারীদের হাতে প্রাণ হারায়, তখন মণিমালারা তার জন্য যথার্থ শোক করতেও অবসর পায় না, বরং চাদর-ঢাকা লাশ ঘরে রেখে নিজেদের ভবিষ্যতের ভাবনায় 'সাধারণ সুখ-দুঃখের ঘরোয়া আলাপ' (মানিক, ২০০৫ক : ২৮০) জুড়ে দেয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব হয় না। মানসিকতার এই বিপুল পরিবর্তনকে লেখক ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে—

> সেই জাপানি বোমার দিন থেকে পথে-ঘাটে ছড়ানো সস্তা অপমৃত্যু, দুর্ভিক্ষ, বিক্ষোভ, আন্দোলন, পুলিশের গুলি, দাঙ্গা হাঙ্গামার ধাক্কা অন্দরে অন্দরে সুরক্ষিত মনগুলি ঘুঁটে দিয়েছে। চরম করেছে এই দাঙ্গা। দিনের পর দিন এক মুহূর্তের শান্তি নেই, স্বস্তি নেই। বাইরে যে যায়, সে ফিরবে কি না জানে না বাড়ির লোক। ফিরে এসে বাড়ির লোককে দেখবে কি না জানে না বাড়ি থেকে যে বাইরে যায়। বাড়িতে সকলে একত্রে উদ্‌বেগ আতঙ্কের পলগুণে সময়ক্ষেপ করে, উন্মত্ত কোলাহলের মধ্যে কখন আবির্ভাব ঘটে দলবদ্ধ ধ্বংসের। কখন কারফিউ নামে, কখন বন্ধ হয় রেশন, হাটবাজার হাঁড়ি চড়া বাতিল হয়ে যায় সংসারে। তবু তারা আলাপ করে, অবস্থা তাদেরও নিজের তালে গড়ে-পিটে সাথে সাথে টেনে নিয়ে চলেছে বলে। (মানিক, ২০০৫ক : ২৮০)

দাঙ্গার বীভৎস বিবরণ নয়, এ উপন্যাসে ঔপন্যাসিক মূল আলোকসম্পাত করেছেন দাঙ্গাবিধ্বস্ত পরিবারের মানুষের মানসিকতার ওপর। গুটিকয়েক স্বার্থান্বেষী মানুষের স্বার্থসিদ্ধির তাণ্ডবে হতচকিত, বিহ্বল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যে ধ্বংসলীলায় মেতে না উঠে আত্মরক্ষার্থেই কেবল তৎপর — সে-উপলব্ধি তীব্র হয়ে উঠেছে এ কাহিনিতে। সেইসঙ্গে কেউ কেউ (যেমন— উষা, রৌশনা) বিরুদ্ধ ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি বিষোদ্‌গার করেছে কিন্তু লক্ষণীয় যে সাধারণ কোনো মানুষই হিংস্র প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠেনি। পাড়ার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ভাঙতে ইয়াসিন গুণ্ডা, সুবোধ সিংহ এবং নাজের আলি একটি হোটেলে বসে মদ খেয়ে কূটবুদ্ধি এঁটেছে — তার পরদিন সকালেই গলির মুখের মন্দিরের সামনে মুসলমান বৃদ্ধা নানির মৃতদেহ রক্তে মাখামাখি হয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়, একইসঙ্গে মন্দিরের লোহার কোলাপ্‌সিবল দরজায় লটকানো দেখা যায় গরুর মাথা। হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মের লোককে আহত করার এই ঘটনাদ্বয়ের মূল পরিকল্পকরা মুহূর্তের মধ্যে শুরু করে দেয় সংঘর্ষ —

> পরিকল্পনাটা যাদের তারা সত্যই তৎপর। মানুষকে চিন্তা করার সুযোগ দিলে যে চলবে না এটা তারা ভালো করেই জানে।...
> শুধু নানির রক্ত নয়, তাতে নিরীহ একটি গোরুর রক্তও মেশানো হয়েছিল দৃশ্যটায় বীভৎসতা বাড়াবার জন্য। এটাও দাঙ্গা চালু করে দেবার প্রাথমিক ঘটনাবলির অঙ্গ — (মানিক, ২০০৫ক : ৩২০-৩২২)

রাজনৈতিক দীক্ষায় দীক্ষিত ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কেবল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির পরিকল্পনাই নয়, তার পেছনের স্বার্থসিদ্ধির স্বরূপও উন্মোচন করেছেন। মৃত্যুর পূর্বদিনে বৃদ্ধা নানিকে অপমান করতে গিয়ে নিজেই উল্টো অপমানিত হয়েছিল দাঙ্গার পরিকল্পক একজন — সুবোধ সিংহ; অন্যদিকে অপর পরিকল্পক ইয়াসিন গুণ্ডা ধীরে ধীরে সুপরিকল্পিতভাবে আয়ত্ত করেছিল নানির সুন্দরী পুত্রবধূকে — উভয়ের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির ঘটনাও ঔপন্যাসিক সুকৌশলে উপন্যাসে গ্রথিত করেছেন।

সচেতন বামপন্থি রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে ঔপন্যাসিকের সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা ছিল। তিনি এই হানাহানির পেছনের রহস্য জানতেন। এ দেশকে লুটেপুটে খেয়ে যারা এদেশের চরম সর্বনাশ করেছে, সেই ব্রিটিশ ঔপন্যাসিক শক্তিই যে আজ ভাইয়ে-ভাইয়ে বিবাদ বাধিয়ে নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছে তার ইঙ্গিতও আছে এ উপন্যাসে—

> কোনো কোনো সাংঘাতিক এলাকায় ট্রামে ড্রাইভারের পাশে রাইফেলধারী ইউনিফর্ম দেখা যায়, দৃশ্যটা হাস্যকর ঠেকে নগরবাসীর কাছে। অনেক মোড়েই রাইফেল ও ইউনিফর্মের, মিলিটারি ইউনিফর্মেরও ঘাঁটি বসেছে, রাস্তা কাঁপিয়ে ঘোরা-ফেরা করছে সশস্ত্র ট্রাক, নগরে তবু ছুরি-ছোরা অ্যাসিড-বোমার খুন-জখম, লুটপাট, আগুন দেওয়ার সমারোহ বেড়েই চলেছে।
>
> দাঙ্গা হানাহানি কর্তাদের লীলা, চাকররা মোড়ে দাঁড়িয়ে ট্রাকে চেপে টহল দিয়ে তা থামাবে! হায় রে তামাশা! (মানিক, ২০০৫ক : ২৯৯)

বস্তুত, ১৯৪৬ এবং ১৯৪৭-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মূল ইন্ধনদাতা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। তারাই ক্ষমতা ছাড়ার পূর্বে এদেশের মানুষের মধ্যে স্থায়ী বিভক্তি বা অশান্তির সৃষ্টিতে সচেষ্ট ছিল — সেইসঙ্গে যুক্ত ছিল এদেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অদূরদর্শিতা। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মতদ্বৈধতার অনিবার্য ফসল এই দাঙ্গা।

> ১৯৪৬ সালের ১৬ মে ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনার পর ব্রিটিশ কেবিনেট মিশন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার লক্ষ্যে একটি পরিকল্পনা পেশ করে। বলা হয়, নতুন সংবিধান প্রণয়নের পূর্ব পর্যন্ত দেশ পরিচালনার স্বার্থে এই পরিকল্পনার প্রতি স্বীকৃতিদাতা দলগুলোর সমন্বয়ে বড়লাটের কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হবে। ৬ জুন তারিখে কেবিনেট মিশনের প্রস্তাবে মুসলিম লীগ সম্মতি দিলেও প্রস্তাবের কোনো কোনো অংশ নিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে মতভেদ সুস্পষ্ট হওয়ার পরে তারা সম্মতি প্রত্যাহার করে। ফলে কংগ্রেসের প্রতিনিধি নিয়েই গঠিত হয় বড়লাটের কার্যনির্বাহক সমিতি। আর এ ঘটনার প্রতিবাদেই মুসলিম লীগ 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' পালনের আহ্বান জানায়। মুসলিম লীগের রক্ষণশীল অংশ ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কংগ্রেসকেও প্রত্যক্ষ সংগ্রামের লক্ষ্যবস্তুরূপে নির্ধারণ করে। এর সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দু সম্প্রদায়ের মুসলিম-বিদ্বেষ যুক্ত হলে সংঘাত হয়ে ওঠে অনিবার্য। (সৈয়দ, ১৯৯৮ : ৩৫১)

ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিতকরণ এবং এ ভূখণ্ডে স্থায়ী অশান্তি সৃষ্টির ব্রিটিশ প্রচেষ্টা দারুণভাবেই সফল হয় ধর্মীয় এই সহিংসতায়। বামপন্থি রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার অধিকারী মানিক এ উপন্যাসে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মনোভাবের সমালোচনা করে তাদের শ্রেণি-চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন। 'গিরিনের মতে, কংগ্রেস-মুসলিম লীগ ব্রিটিশ রাজশক্তির শত্রু নয়, বরং বিপক্ষ।' লেখক স্পষ্ট দেখিয়েছেন যে, শ্রমিক শ্রেণি দাঙ্গার বিরুদ্ধে এবং তারাই দাঙ্গা বিরোধী সভা-শোভাযাত্রার আয়োজন করেছে।

কিছু ছোটগল্পের সীমিত পরিসরেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার স্বরূপ উন্মোচনের প্রয়াস পেয়েছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। আগেই বলা হয়েছে, পটভূমি হিসেবে দাঙ্গা উপজীব্য হয়েছে তাঁর 'খতিয়ান', 'ভালবাসা', 'ছেলেমানুষি', 'স্থানে ও স্তানে' প্রভৃতি গল্পে।

খতিয়ান গল্পগ্রন্থের নামগল্প 'খতিয়ান'-এ দাঙ্গার পটভূমিতে শ্রেণি-দ্বন্দ্ব, শ্রমিক সংগ্রাম, ছাটাই-ধর্মঘট ইত্যাদি এবং প্রান্তিক শ্রমিক শ্রেণির চৈতন্যোদয় এবং একশ্রেণিতে একীভূত হবার বিষয়টি উঠে এসেছে। একই কারখানায় সহকর্মী, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ধর্মঘটে সঙ্গী হওয়া এক বন্ধুর বাড়িতে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী অন্য বন্ধু আশ্রয় নেয় নিতান্ত প্রাণের তাগিদে। ভাঙা চৌকির নিচে লুকিয়ে রেখে সে নিজেদের সীমিত রেশন দিয়েই বন্ধুর মুখে আহার

জুগিয়ে চলে বন্ধুত্বের টানে, মানবতার খাতিরে। বন্ধুর বউ বিরক্ত হয়, নিচু গলায় প্রতিবাদ জানায় তাদের টানাটানির সংসারে বাড়তি মুখের খাবার জোগাতে; কিন্তু নিজেদের বিপদের আশঙ্কায় তটস্থ হলেও বন্ধুর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় এমন কোনো পদক্ষেপ নেয় না সে। লেখক এ প্রসঙ্গটি বিবৃত করেছেন এভাবে—

> তাকে লুকিয়ে রেখে পাড়ার প্রতিহিংসায় উন্মাদ মানুষগুলির কাছে অপরাধ করার অনুভূতি আর ধরা পড়লে শাস্তির ভয়টা স্বামীর চেয়ে তার অনেক বেশি তীব্র। আপদ বিদায় করে স্বস্তি পাবার সহজ উপায়টার কথা তবু কিন্তু একবারও তার মুখে শোনা যায় না। (মানিক, ২০০৫ : ২১০)

দুদিন পর চৌকির তলার দমবন্ধ অথচ নিরাপদ পরিবেশ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে স্বজনের টানে বড় রাস্তার অপর পাশের বস্তিতে নিজ বাড়ি অভিমুখে যাত্রা করে সে। বড় রাস্তার প্রাণঘাতী হামলা এড়াতে ঘুরপথে সাহেব পাড়ার ভেতর দিয়ে যাবার সময় এলাকার শান্ত, নিরুদ্বেগ আবহাওয়া বিভ্রান্ত করে তাকে। কিছুদূরে বড় রাস্তায় প্রাণঘাতী সংঘর্ষ, কোলাহল চলছে অথচ সেখানে সাহেব পাড়ার নিয়মিত জীবন ছন্দপতনহীন, এই বিপ্রতীপতা তাকে আহত করে। বস্তি এলাকার আকাশ যেখানে আগুনে লাল, বাতাস যেখানে ধোঁয়া ও মাংসপোড়া গন্ধে পূর্ণ, বস্তি এলাকার পর ইটের বাড়ির এলাকা অর্থাৎ মধ্যবিত্ত পাড়া পথ যেখানে জনশূন্য কিন্তু মৃতদেহ-আকীর্ণ সেখানে সাহেবপাড়ার আলোকিত 'পথটিতে যেন রাশি রাশি শান্তি ও শুচিতা ছড়ানো' (মানিক, ২০০৫ : ২১২)। সাহেব পাড়ার একটি বাড়ি থেকে ভেসে আসা পিয়ানোর টুং টাং আওয়াজে ধনী-গরিবের চরম বৈপরীত্য পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ধর্মের জিগিরে সৃষ্ট হানাহানি শেষ হলে কর্মক্ষেত্রে দু-বন্ধুর কথোপকথনে দাঙ্গার স্রষ্টা ও ফলভোগীর পরিচয় আভাসিত —

> দেখলি তো? আমরা শালা গরিবরাই মরলাম।
> না তো কী ? কে মরবে তবে?
> ওনারা সব ঠিক আছেন বাহাল তবিয়তে।
> তা রইবেন না? বাহাল তবিয়তে রইবার জন্যে তো এত কাণ্ড। (মানিক, ২০০৫ : ২১২)

খানিকপর তারা দু-বন্ধুসহ চল্লিশ জন ছাটাই হয় কর্মস্থল থেকে। একমাস আগে তিনজনকে বিনা কারণে ছাঁটাই করা হলে তারা প্রতিবাদ-ধর্মঘটে মালিক পক্ষকে বাধ্য করেছিল ওই তিনজনকে কাজে ফিরিয়ে নিতে, একমাস পর একত্রে চল্লিশ জনকে কাজ থেকে বাদ দেয়া হলেও সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায় না — কেননা জাত-পাতের হানাহানিতে শক্তি তাদের ক্ষয় হয়েছে ব্যাপক। উপরন্তু দাঙ্গা-জনিত পরিস্থিতিতে জরুরি অবস্থা জারি করায় সংঘবদ্ধ হতে যেমন তারা পারেনি, তেমনি প্রতিবাদও গড়ে ওঠেনি। বরং ১৪৪ ধারা অমান্যের অপরাধে তারা গ্রেফতার হয় পুলিশের হাতে। গল্পের সমাপ্তিতে বন্ধুদ্বয়ের উপলব্ধিজাত দর্শন তাদের সংলাপের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় —

> বল শালা তোর কোনো জাত নেই, আমার কোনো জাত নেই। তুই গরিব, আমি গরিব।
> আমরা গরিবের জাত। (মানিক, ২০০৫ : ২১৩)

গল্পের অন্তিমে এ সংলাপের মধ্য দিয়ে প্রকৃতপক্ষে লেখকের মৌল উদ্দেশ্য সার্থকতা পেয়েছে। গল্পকার সূচনা থেকেই সতর্ক সচেতনতার সঙ্গে বিশেষ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যই

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে পটভূমি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। লক্ষণীয় যে, ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বন্ধুদ্বয়ের গল্প এটি — তাদের কোনো নাম-পরিচয় দেয়া হয় নি, তারা প্রথম থেকেই নাম-পরিচয়ের ঊর্ধ্বে দরিদ্র শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। অথবা নাম নেই বলে কে হিন্দু, কে মুসলমান তা যেমন বোঝা যায় না, কে আশ্রয়দাতা আর কে আশ্রয়প্রার্থী অথবা কে আক্রান্ত আর কারা আক্রমণকারী তা গৌণ হয়ে যায়। বিশেষ কোনো শ্রমিকের জীবন নয়, শ্রমিক জীবন অবলম্বনে গল্পের কায়ানির্মাণে নামহীনতা তাই তাৎপর্য পেয়েছে। ধনী-গরিবের বৈপরীত্যের পাশাপাশি ধর্ম-বিদ্বেষজাত হানাহানির অসারত্ব নির্দেশ করেছেন গল্পকার গভীর হৃদয়াবেগের সঙ্গে। ধর্মীয় পরিচয়ের ঊর্ধ্বে তিনি মানুষ নামের পরিচয়কে স্থান দিয়েছেন। গল্প-অন্তর্গত নিম্নোক্ত অংশে তার প্রমাণ মেলে —

> ধীরে ধীরে সে মুখ তুলে তাকায় আকাশের দিকে, তার ঠোঁট নড়তে থাকে, গ্রহ-তারার অনন্ত রহস্যের আড়ালে যিনি গা ঢাকা দিয়ে আছেন তাকে শুনিয়ে সে জিজ্ঞেস করে, মড়াপচা গন্ধ শুঁকে বুঝতে পারছ কোনটা হিঁদুর, কোনটা মুসলমানের? মাংসপোড়া গন্ধ শুঁকে বুঝতে পারছ কোনটা হিঁদুর কোনটা মুসলমানের? (মানিক, ২০০৫ : ২১২)

এ উচ্চারণ নিরীশ্বরবাদিতার নয় বরং স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসী আস্তিক মানুষের স্রষ্টার প্রতি গভীর অভিমান থেকে উৎসারিত। বস্তুত, মানুষ যে কেবল ধর্ম ও পোশাকের কারণে আলাদা হতে পারে না — তার সজোর প্রকাশ ঘটেছে এ উদ্ধৃতিতে। নাম ও পোশাকের ভিন্নতায় জাতি-বিভেদের অসারতাকে যেন চোখে আঙুল দিয়ে নির্দেশ করেন গল্পকার এ গল্পে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মূল আয়োজক ধনিক শ্রেণি এবং তারা তাদের ফায়দার জন্য, দরিদ্র লোকের ভেতর হানাহানি লাগিয়ে তাদের আরও কমজোর করে শোষণচক্রকে অব্যাহত রাখতে প্রতিনিয়ত এ ধরনের রাজনৈতিক কৌশলের শরণাপন্ন হচ্ছে, গল্পকারের এ দর্শনকে সামনে রেখে গল্পটি রচিত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজতান্ত্রিক মনোভঙ্গির শৈল্পিক প্রকাশ ঘটেছে এ গল্পে।

ছোটবড় (১৯৪৮) গল্পগ্রন্থের বেশ কয়েকটি গল্প সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিতে রচিত। 'ভালোবাসা', 'স্থানে ও স্তানে', 'স্টেশন রোড' প্রভৃতি গল্প দাঙ্গাকে উপজীব্য করে রচিত; তবে দাঙ্গার বীভৎসতা কিংবা নির্মমতা ছাপিয়ে উপদ্রুত জনপদের ব্যক্তি-মানুষের মনস্তত্ত্ব মুখ্য হয়েছে এ গল্পগুলোতে। 'ভালবাসা' গল্পের কাহিনি সরলরৈখিক। স্বামীঅন্তপ্রাণ মালতী বিয়ের একবছর না পেরোতেই স্বামীকে হারায় দাঙ্গার কারণে। তার স্বামী বিপিন দাঙ্গা থামাবার শান্তিসেনায় যোগ দিয়েছিল দাঙ্গা-উপদ্রুত জনপদকে রক্ষা করতে কিন্তু নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি স্বার্থান্বেষী দাঙ্গাকারীর কবল থেকে। স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর মৃতদেহের সন্ধানে স্বামীর বন্ধু ও প্রতিবেশী সতীনাথকে সঙ্গে নিয়ে মালতী পথে বের হলে দাঙ্গাবিরোধী এক শান্তি মিছিলের মুখোমুখি হয়। মরণ-যজ্ঞের আগুন নেভানোর আহ্বানরত ছেলেমেয়েদের সঙ্গে যোগ দিয়ে শান্তি শোভাযাত্রায় মালতী তার গন্তব্য খুঁজে পায়। স্বামীর মৃতদেহ সন্ধানী মালতী এ শোভাযাত্রায় একাকার হয়ে স্বামীর প্রতি তার ভালোবাসাকে সার্থক করে তোলে।

সরল প্লটের আধারে মালতী-হৃদয়ের মনস্তত্ত্বের জটিলতা প্রাধান্য পেয়েছে এ গল্পে। প্রথমাবধি মালতী বিপিনকে হারানোর আশঙ্কায় আতঙ্কিত। দাঙ্গা-বিপর্যস্ত জনপদে প্রতিমুহূর্তে ভালোবাসার জনকে হারানোর যে আতঙ্ক তা মালতীর মাধ্যমে পরিপূর্ণ রূপ পেয়েছে —

> মালতীর শুধু দুপুর নয়, বুকের ধুকধুকানির কখনো তার বিরাম নেই। বাড়ি ফিরলেও কি শান্তি আছে? আজকের মতো নয় নিশ্চিন্ত, কাল? কাল তো আবার যেতে হবে, ফিরতে হবে?... ঘরেই কি স্বস্তি আছে? কখন কী হয়, কখন কী হয়। এ বস্তিতে আগুন, ও বস্তিতে আগুন, এ পাড়ায় হানা, ও পাড়ায় হানা — (মানিক, ২০০৫ : ২৮৭)

একবছর আগে পোড়া গলির ওপাশের বস্তির ধ্বংসাবশেষ প্রতিমুহূর্তে মালতীকে সে দিনের দুঃসহ স্মৃতির সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। 'ভস্মস্তূপের দিকে চোখ পড়লেই তার মনে পড়ে যায় দিনদুপুরে সেই বীভৎস কোলাহল, আগুনের রক্তিম শিখা আর মন-প্রাণ চিরে চিরে দেওয়া অবর্ণনীয় আর্তনাদ।' (মানিক, ২০০৫ : ২৮৮) এ দৃশ্য, সে দেখতে চায়নি, এ আওয়াজও সে শুনতে চায়নি — কিন্তু তার চাওয়া না চাওয়ার গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয় সামাজিক-রাজনৈতিক স্বেচ্ছাচার। জগতের অপার সৌন্দর্যের সন্ধান না করে তাই মৃত্যুর অন্ধকূপে নিমজ্জিত হতে হয় মালতীকে। স্বামীর মৃত্যুর সংবাদে মালতী আর্তনাদ করে না, শব্দ করে কাঁদে না বরং নির্বিকারভাবে বের হয়ে পড়ে বিপিনের মৃতদেহের সন্ধানে। তার এ প্রতিক্রিয়া আকস্মিক কিংবা নাটকীয় নয়। মধ্যবিত্ত এ তরুণীর জীবনের একমাত্র অবলম্বন হারানোর সঙ্গে সঙ্গে তার বেঁচে থাকা অর্থহীন হয়ে পড়েছে। তাই হারাবার শঙ্কা আর নেই। জীবন ও কর্মের প্রবাহকে অক্ষুণ্ন রেখে প্রাণ হাতে নিয়ে প্রায় বৎসরাধিক কাল দাঙ্গা-উপদ্রুত শহরে সাধারণ নাগরিকের বিপন্ন, বিপর্যস্ত মনস্তত্ত্বের বিবরণ চমৎকার শৈলীতে মালতী চরিত্রের মাধ্যমে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'ভালবাসা' গল্পে প্রকাশ করেছেন।

লিও টলস্টয়ের একটি গল্পের[১] আদলে রচিত 'ছেলেমানুষি' গল্পেও দাঙ্গা-বিপর্যস্ত নগরের চালচিত্র ধরা পড়েছে। পাশাপাশি বাড়ির তারাপদ ও নাসিরুদ্দীনের পরিবারের সখ্য, ধর্মের বিভিন্ন বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে কন্যা গীতা ও নাসিরুদ্দীনের পুত্র হাবিবের ছেলেমানুষি দাঙ্গা-দাঙ্গা খেলার সূত্র ধরে পরস্পরের জখম হওয়া এবং সে উত্তেজনা বড়দের মাঝে ছড়িয়ে গিয়ে সমগ্র পাড়ায় অস্থিতিশীল অবস্থা তৈরি এবং ক্রমে প্রশাসন পর্যন্ত নড়ে ওঠার ঘটনা যখন ঘটে তখন দেখা যায় চিলেকোঠার ছাদে ছেলেমেয়ে দুটি পূর্বের ঘটনা ভুলে নতুন করে শুরু করা খেলা ছেড়ে বড়দের ছেলেমানুষি দেখছে পরম কৌতূহলে।

এ গল্পে গীতা ও হাবিবের ছেলেমানুষি খেলার বর্ণনার মধ্য দিয়ে বেশ কয়েকটি বিষয় গল্পকার স্পষ্ট করেছেন। প্রথমত, আবহমান কাল ধরে এ দেশের হিন্দু ও মুসলমানের পাশাপাশি আন্তরিকতা ও পরম সহৃদয়তার সঙ্গে বসবাস, বন্ধনহীন মেলামেশা এবং পরস্পরের ধর্মীয় আচারের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব তারাপদ ও নাসিরুদ্দীন পরিবারদ্বয়ের প্রতীকী পরিচর্যায় প্রকাশিত হয়েছে। গল্পকার শুরুতেই শ্রেণিগত অবস্থানে এদের একীভূত করে বর্ণনা করেছেন —

> ব্যবধান টেকেনি। কতটুকু আর পার্থক্য জীবনযাপনের সুখদুঃখ, হাসিকান্না, আশা-আনন্দের, ঘৃণা-ভালোবাসার। সকালে কাজে যায় তারাপদ আর নাসিরুদ্দীন, অপরাহ্নে ফিরে আসে অবসন্ন হয়ে। ব্যর্থ স্বপ্ন উৎসুক কল্পনা দিন দিন জমে ওঠে একই ধরনের, ক্ষোভ দিনে দিনে তীব্র হয় দুটি বুকে একই শক্তির বিরুদ্ধে। ইন্দিরা আর হালিমা যাপন করে বন্দী জীবন,– রাঁধে বাড়ে বাসন মাজে স্বপ্ন দেখে আর অকারণ আঘাত মুখ বুজে সয়ে চলে অবুঝ নিষ্ঠুর সংসারে। (মানিক, ২০০৫ : ২৯৮)

এ অংশে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে এ দেশীয়দের ক্ষোভের। বস্তুত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির সযত্ন পরিচর্যা ও ইন্ধনে আবহমান কাল ধরে পাশাপাশি নিরুদ্বেগে বসবাসরত দুই সম্প্রদায়ের মধ্যকার হিংসা ও ঘৃণাজাত হানাহানির ঘটনা ঘটেছে বলে মনে করা হয় এবং গল্পকার তারই ইঙ্গিতবহ মন্তব্য করেছেন।

ইন্দিরা ও হালিমার সখ্য নিবিড় হয়ে ওঠে তাদের সন্তানদের কল্যাণে। গীতা ও হাবিব বর-বউ খেলে, গীতার জন্য নিষিদ্ধ মাংস সে হাবিবদের বাড়িতে খায়, হাবিব অঞ্জলি দেয় গীতাদের সরস্বতী পূজায় — উভয়ের বাবা-মা তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে। তারাপদর পিসি এবং নাসিরুদ্দীনের মা — অর্থাৎ পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যরা স্বভাবতই রক্ষণশীল। তারা এগুলোকে বাড়াবাড়ি বলে বন্ধ করার দাবি জানায় অথচ কিছুক্ষণ পর তাদের দুজনকে দেখা যায় সামনাসামনি দাঁড়িয়ে গল্প করতে। দু-সম্প্রদায়ের বৈরিতা নয়, শান্তি ও আন্তরিকতাপূর্ণ সহাবস্থানের এ পট কল্পিত নয়, একান্তই বাস্তব।

দ্বিতীয়ত, এই বাস্তবতার ভূমিকে বিদীর্ণ করে দাঙ্গা-উদ্ভূত পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত-সংহত বিবরণ পাওয়া যায় এ গল্পে। শহরে দাঙ্গা শুরু হলেও এ পাড়ায় সকলে মিলে গড়া পিস-কমিটি প্রকৃতই শান্তি বজায় রাখতে পেরেছে, আরোপিত আদর্শ বা ভাবোচ্ছ্বাসের জোরে নয় — সবার প্রয়োজনে। এ পাড়া হিন্দু বা মুসলমান-প্রধান নয় — বরং এ দুসম্প্রদায়ের মেশাল পাড়া। দাঙ্গা শুরু হলে দু'পক্ষই সমান ক্ষতিগ্রস্ত হবে — তাই নেহাৎ প্রয়োজনে শান্তি বজায় রাখার কঠোর নিয়মানুবর্তিতায় দু' পক্ষই সক্রিয়।

তৃতীয়ত, দাঙ্গা-প্রতিরোধে প্রশাসন-যন্ত্রের হাস্যকর ছেলেমানুষি আচরণ এ গল্পে তীব্র স্যাটায়ারের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। গীতা ও হাবিবের দাঙ্গা-দাঙ্গা খেলার সূত্র ধরে গোলমালের দিন বিকেলে পুলিশের লরি আসে। গোলমালের উৎস সম্পর্কে জানতে চায় তারা, কোনো গোলমাল হয়নি শুনে ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে ফিরে যায় না বরং সৈন্য ঘাঁটি বসায় গলির মোড়ে। সহায়ের বদলে শঙ্কায় পরিণত হয় পুলিশের দল এবং অচেনা আতঙ্কের আভাসে জনশূন্য হয় পাড়ার পথ-ঘাট।

চতুর্থত, দেশবিভাগের বিষয়টি খুব সামান্য তবে দার্শনিক মনোভঙ্গিতে প্রকাশিত হয়েছে এ গল্পে। গল্পকারের এ সম্পর্কিত মনোভঙ্গি শিল্পিত রূপ পেয়েছে কাহিনির বয়নে।

> তাই তো বলি পাখি নাকি আমরা, হালিমা বলে মুখোমুখি জানালায় দাঁড়িয়ে, তাড়া খেয়ে খেয়ে আজ এখানে কাল সেখানে উড়ে বেড়াব? গাছের ডালে বাসা বানাব? (মানিক, ২০০৫ : ৩০০)

হালিমার এ জিজ্ঞাসা দেশবিভাগের রাজনৈতিক পটভূমির যৌক্তিকতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। যারা তাদের ভাগ্য-নির্ধারণের বিধাতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে — তাদের প্রতি তীব্র শ্লেষ শব্দরূপ পেয়েছে এ অংশে। প্রকৃতপক্ষে হাবিব ও গীতার রূপকে গল্পকার হিন্দু-মুসলমান দু-সম্প্রদায়কে রূপায়িত করেছেন এবং গীতা-হাবিবের মতোই সম্প্রদায়গত হানাহানি যে ছেলেমানুষি ব্যাপার তা ব্যক্ত করেছেন এ গল্পে।

'স্থানে ও স্তানে' গল্পের নামকরণের মাধ্যমেই দু-সম্প্রদায়ের বৈপরীত্য প্রকাশ পেয়েছে। ঢাকাবাসী নরহরি চাকরি স্থায়ীকরণের প্রয়োজনে কলকাতা থেকে স্ত্রীকে আনতে যায় নিজ বাসস্থানে। ঢাকার লোকেরা তাকে বিশ্বাস করতে পারে না — আবার কলকাতা নিবাসী শ্বশুরকুলকে সে বিশ্বাস করাতে পারে না তার প্রয়োজনীয়তা। শ্বশুর ও শ্যালকদের ডিঙিয়ে স্ত্রীর কাছে পৌঁছাতে পারলেও তার মতের অনুকূলে আনতে পারে না স্ত্রীকে। কলকাতা যখন মুসলমানদের মৃত্যুপুরী, তখন ঢাকাও হবে হিন্দুদের নিপীড়নস্থল — সে ধারণা থেকে কিছুতেই বের হয়ে আসতে পারে না নরহরির শ্বশুরকুল। বরং সামান্য বিচ্ছিন্ন আলাপেই নরহরির বিবমিষা জাগে তাদের নৃশংসতা ও অবোধ্যতার জন্য। উড়িষ্যার লোকেরা বাঙালি মেয়েদের ওপর অত্যাচার করেছে এ সংবাদে উদ্বেলিত হয়ে নরহরির মেজো শালা শ্যামল ও তার সঙ্গীরা এক উড়িয়া চাকর ও মোড়ের মুড়িমুড়কির দোকানদার অর্জুনকে যখন মৃতপ্রায় করে এবং ঝি ও অর্জুনের বউকে ধরেও ছেড়ে দিয়ে ভদ্রতার বড়াই করে তখন নরহরির তা অসহ্য বোধ হয়। স্টেশন থেকে আসার সময় যখন সে নিঃসঙ্গ পথচারীকে অনেকগুলো ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোককর্তৃক নিহত হবার ঘটনা প্রত্যক্ষ করে তখন হিংস্র আবহাওয়ায় তার দম আটকে আসে। বস্তুত এ গল্পে দু-দেশের দু-সম্প্রদায়ের মানুষের পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস ও ঘৃণার বাস্তব চিত্র রূপায়িত হয়েছে।

গল্পের নামকরণ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ — 'স্থান' সম্ভবত হিন্দুস্থান অর্থাৎ ভারত এবং 'স্তান' বলতে পাকিস্তানকে বোঝানো হয়েছে — এ সিদ্ধান্ত নেওয়া খুব অসঙ্গত বোধ হবে না। গল্পের মুখ্যচরিত্র নরহরির ঘরবাড়ি, কর্মস্থল পূর্ববাংলায়- ঢাকায়। কলকাতার তুলনায় ঢাকার জীবন শান্ত, নিরুপদ্রব; আশঙ্কা সেখানেও আছে, তবে তা মনে, প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় নয়। অবিশ্বাস সেখানেও আছে — আর আছে বলেই নরহরির কলকাতা যাত্রাকে অনেকে পলায়ন বলে বিদ্রূপ করে। গল্পের প্রথমাংশেই গল্পকার দাঙ্গার নারকীয়তায় বিপর্যস্ত কলকাতার বিপ্রতীপে পূর্ববাংলার উদার সহাবস্থানের ইঙ্গিত করেছেন কলকাতাগামী স্টিমারের বর্ণনাচ্ছলে —

> স্টিমারে অসম্ভব ভিড়। পলাতক আছে, সবাই নয়। ভিড় এ স্টিমারে বরাবর হয়, জীবনযাত্রার প্রয়োজনে, ছড়ানো জীবনের সঙ্গে যোগসূত্রের কল্যাণে, এমনি গোরুছাগলের মতোই মানুষ বরাবর যাতায়াত করে আসছে। তার মধ্যেও যেন কেমন শান্তি-শৃঙ্খলা সামঞ্জস্য ছিল। নদীর বিস্তৃতির সঙ্গে খাপ খাওয়ানো একটা উদারতা। আজ সকলের চোখেমুখে নড়াচড়ায় কথা বলার ভঙ্গিতে সমবেত গুঞ্জনে একটা চাপা উত্তেজনা, প্রত্যাশা ও ভয়, দম্ভ ও পরাজয়, উদ্বেগের চঞ্চলতা। অথচ অসংখ্য ব্যবহারে মুহূর্তে মুহূর্তে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে মীমাংসাহীন অচেতন আদান-প্রদানে, সবাই ঠিক আগের মতোই মানুষ। মনে হয়, বাইরে থেকে আরোপ করা কৃত্রিম এক চেতনায় যেন আবর্ত আর সংঘাত সৃষ্টি করেছে। (মানিক, ২০০৫ : ৩০৭)

দুই বাংলার মানুষের মানসিকতার বৈপরীত্যকে আরও স্পষ্ট করা হয়েছে গল্পের অন্তিমে এসে। অবিশ্বাসের দোলাচল ভাঙতে নরহরি কলকাতার তথাকথিত নিরাপদ (হিন্দুদের জন্য) আশ্রয় থেকে তার স্ত্রী ও সন্তানদের ঢাকা নিয়ে আসতে চায়। পূর্ববাংলার লোকেদের মনে এ প্রতীতি জন্মাতে চায় সে পালাবে না। তাতে তার চাকরি স্থায়ী হবে সত্য, তবে বোধহয় তার চেয়ে বেশি সত্য, পূর্ববাংলা তার নিজের দেশ — স্বদেশে স্থায়ী হয়ে স্বদেশবাসীর আস্থা অর্জন তার অভীষ্ট। যদিও শ্বশুর-শ্যালকদের বোঝাতে সে ব্যবহার করে চাকরি চলে যাবার মোক্ষমযুক্তি —

> — কর্তাকে তো থাকতে হবে ওখানে, ও দেশের লোক হয়ে? যখন খুশি ফেলে পালিয়ে আসার জন্য তৈরি থাকব, তবু কর্তা আমায় পায়ে তেল দিয়ে রাখবে? যে পরিবার নিয়ে থাকবে বলে আছে তাকে ছাড়াবে আমায় রেখে? (মানিক, ২০০৫ : ৩১০)

এতেও যখন কাজ হয় না বরং চাকরি ছেড়ে কলকাতায় থাকার উপদেশ দেয়া হয়, কলকাতা নিবাসী সাম্প্রদায়িক হিংসায় বিক্ষুব্ধ শ্যালকের উদ্দেশে সে সক্ষোভে উচ্চারণ করে—

> আমরা যদি ডুমড় হই, আপনাদের জন্য হব। আপনারাই আমাদের বড়ো শত্রু। (মানিক, ২০০৫ : ৩১১)

সমকালের পরিপ্রেক্ষিতে এ উচ্চারণ অত্যন্ত সাহসী। উপমহাদেশীয় রাজনীতিতে পূর্ব ও পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ভূমিকাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে উচ্চারিত এ মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ।

১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বাংলাকে বিভাজিত করেছিলেন উপনিবেশ সুরক্ষার প্রয়োজনে বা স্বেচ্ছাচারিতায়। প্রবল আপত্তি ও প্রতিরোধের তোপে ছয় বছরের মধ্যে সে সিদ্ধান্ত উবে যায়। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়। ১৯৪৭ সালের আগস্টে র‍্যাডক্লিফের কলমের এক আঁচড়ে স্থায়ীভাবে বাংলার যে বিভাজন তা কিন্তু আকস্মিক নয় বরং পরিকল্পিত। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ভয়াবহ দাঙ্গার ফলস্বরূপ এ বিভাজন যৌক্তিকতা পায় এবং এ বিভাজনের জন্য ব্যাপকভাবে দায়ী করা হয় বাঙালি মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে স্থিত হওয়ার বাসনাকে। বলা হয়ে থাকে শিক্ষা ও অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ মুসলমানরা চাকরি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অগ্রগামী হিন্দুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ার কারণে পৃথক হতে চেয়েছে এবং তাদের চাহিদার কারণেই বাংলা বিভক্ত হয়েছে। অথচ সত্যিটা ছিল ভিন্ন এবং বর্তমানে ক্রমশ তা প্রকাশিত হচ্ছে।

১৯৯০ সালে লন্ডনের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপিত একটি ডক্টরাল থিসিস (*Bengal Divided : Hindu Communalism and Partition 1932-1947*, Cambridge, 1994)-এ বিস্তারিত আলোচনা করে দেখানো হয়েছে, ১৯৪৭-এর বাংলা বিভাগের পেছনে সক্রিয় ছিল তথাকথিত ভদ্রলোক শ্রেণি, যারা ধর্মগতভাবে হিন্দু (উচ্চবর্ণের) এবং সমগ্র বাংলায় সংখ্যালঘিষ্ঠ — তারা নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য সুপরিকল্পিভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলা বিভাগকে অপরিহার্য

করেছিল। এ গবেষণায় দেখানো হয়, ১৯৩১ সালের আদমশুমারিতে বাংলার মোট জনসংখ্যার মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ২৭.৮ মিলিয়ন অর্থাৎ শতকরা ৫৪ ভাগ। ১৯৩২ সালে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রণীত সম্প্রদায়গত রোয়েদাদে মুসলমানদের দেওয়া হয় আইনসভার মোট আসনের শতকরা ৪৭.৮ ভাগ, অনুন্নত শ্রেণি, মুসলিম মহিলা ও অন্যদের জন্য সংরক্ষিত আসন বাদ দিয়ে হিন্দুদের জন্য দেয়া হয় মোট আসনের মাত্র ২৮ ভাগ। সম্প্রদায়গত এই রোয়েদাদ আইন সভায় বাঙালি ভদ্রলোক (হিন্দু)দের দুর্বল সংখ্যালঘিষ্ঠে পরিণত করে। 'অধস্তন' মুসলমানদের শাসনকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি বাংলা বিভাগ এবং পৃথক হিন্দু আবাসভূমি প্রতিষ্ঠাকে এগিয়ে নেয়। বাংলাকে ভাগ করার জন্য ভদ্রলোকেরা [ষাটের দশকে জে. এইচ. ব্রুমফিল্ড 'ভদ্রলোক' কথাটি ব্যবহার করেন 'পাশ্চাত্যভাবাপন্ন সর্বোৎকৃষ্ট শ্রেণীর লোক' হিসেবে এবং তাদের গণ্য করেন 'ওয়েবারিয়ান (Weberian) গ্রুপের লোকদের মর্যাদাসম্পন্ন লোকদের মতো। ঐ কথাটিকে অন্য একজন ঐতিহাসিক গ্রহণ করেছেন 'উচ্চ বর্ণের ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত সুবিধাভোগী বাঙালি সমাজের অভিজাত শ্রেণীর' লোক হিসেবে। (জয়া, ২০১৪ : ৩)] কীভাবে সংঘবদ্ধ আন্দোলন পরিচালনা করে এবং এই প্রয়াস কীভাবে বাংলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ক্রমবর্ধমান ইন্ধন যুগিয়েছিল, সে সম্পর্কে বিস্তারিত বিশ্লেষণসহ তথ্যাদি উপস্থাপন করা হয়েছে এ গবেষণা-পত্রে।

গবেষক ভূমিকাতে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন—

> হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ভয়াবহ দাঙ্গার ফলে ১৯৪৭ সালে বাঙলা আবার ভাগ হয়। কিন্তু এ সময় প্রায় কারও কণ্ঠেই প্রতিবাদের ধ্বনি উচ্চারিত হল না, বরং দ্বিতীয় বার বাঙলা ভাগ নিশ্চিত হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে একটা সংঘবদ্ধ আন্দোলন পরিচালিত হল — যার লক্ষ্য ছিল ধর্মের ভিত্তিতে প্রদেশকে ভাগ করা। এই আন্দোলনে বাঙালি সমাজের সেই শ্রেণির লোকেরাই নেতৃত্ব দেয়, যারা বাঙলার প্রথম বিভাগের সময় থেকে জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে প্রাধান্য বিস্তার করে আসছিল, যাদের পরিচিতি ছিল তথাকথিত ভদ্রলোক বা 'সম্মানিত লোক'। মাত্র চল্লিশ বছরেরও কম সময়ের ব্যবধানে ভদ্রলোক রাজনীতি তার সূচনা বিন্দুতে এসে সমাপ্ত হল — তারা জাতীয়তাবাদী বিষয়সূচি থেকে সংকীর্ণ বা সীমাবদ্ধ বিষয়ের দিকে সরে গেল। (জয়া, ২০১৪ : ১)

প্রকৃতঅর্থে ইতিহাসের পুনর্মূল্যায়নে মুদ্রার ওপিঠটা আজ উন্মোচিত হয়েছে। তবে দীর্ঘকাল দাঙ্গা ও দেশবিভাগের দায়ভার বয়ে বেড়াতে হয়েছে মুসলমানদের। এ সম্পর্কে কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রত্যক্ষদর্শী প্রখ্যাত শিল্পী কামরুল হাসানের মন্তব্য তাঁর স্মৃতিচারণমূলক রচনা 'আমার মাস্টার মশাই : জয়নুল আবেদিন' — থেকে উদ্ধৃত করা হলো—

> এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যে বাধবে, এ বিষয়ে বহু আগে থেকেই আমাদের ভেতর একজন নিশ্চিত ঘ্রাণ পেয়েছিলেন। তিনি আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় মরহুম কাজী মোহাম্মদ ইদ্রিস ভাই।...
>
> তিনি বলেছিলেন, 'দাঙ্গা বাধাবে অপরপক্ষ, কিন্তু দোষ হবে আমাদের– দেখে নিয়ো।' হলোও তাই। ...
>
> ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্টকে ঘোষণা করা হয়েছিল কেবল পাকিস্তানবিরোধীদের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখার জন্য, দাঙ্গা বাধানোর জন্য নয়। কলকাতার মুসলমানদের সামনে গড়ের মাঠে জনসভায়

> সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব তাঁর বক্তব্য পেশ করবেন, সবাই দলে দলে যোগদান করবে — এই ছিল প্রত্যাশা। দলে দলে যোগদান করেছিলাম। দলে দলে সবাই গিয়েছিল সভায়। লাঠিসোটা নিয়ে যায়নি কেউ, বরং কলকাতার চিরাচরিত মিছিলের রীতি অনুযায়ী ঢাক, ঢোল, ব্যান্ড-বাদ্য ইত্যাদি নিয়ে গিয়েছিল। এটা আমার নিজের চোখে দেখা। আজও চোখ বুজলে পরিষ্কার দেখতে পাই সে দৃশ্য। হিন্দু মহাসভার দীর্ঘদিনের মিলিত প্রচেষ্টা এবং প্রচারের মাহাত্ম্যকে এ ব্যাপারে প্রশংসা না করে পারছি না। কেননা, দাঙ্গা লেগে যেতে দেরি হলো না। বোধহয় ১৭ আগস্ট সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব অ্যাসেম্বলিতে কংগ্রেস সদস্যদের সামনে ওই যুক্তিই তুলে ধরেছিলেন যে 'দাঙ্গা করার মতলব থাকলে লোকে লাঠিসোটা, ঢাল, তলোয়ার (তখন এসএলআর বা এসএমজি চালু হয়নি) নিয়েই আসত, বোকার মতো মার খাওয়ার জন্য ব্যান্ড বা ঢাকঢোল নিয়ে নাচতে নাচতে আসত না। তিন দিন হিন্দু-অধ্যুষিত পাড়ার মুসলমান বাসিন্দাদের ওপর যে পাইকারি ও অরগানাইজড আক্রমণ চালানো হয়েছিল, এরও আমি প্রত্যক্ষদর্শী। অবশ্য ওই কয় দিন মুসলমান পাড়ার হিন্দুরাও যে আক্রান্ত হয়নি, তা অস্বীকার করব না। তবু প্রথম দিনে মুসলমানেরা কলকাতার আদি হিন্দুর মিষ্টির দোকান যে মহানন্দে লুট করে মিষ্টি নিয়ে কাড়াকাড়ি-হুড়োহুড়ি করেছে, এ দৃশ্যও আমার নিজের দেখা। দাঙ্গার সংজ্ঞা তখন অবধি কলকাতার আদি মুসলমানদের কাছে কেবল অন্য সম্প্রদায়ের জিনিস লুটপাটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অতএব ১৬ আগস্টের সন্ধ্যায় যেই রটে গেল হিন্দু-মুসলমান লড়াই বেধে গেছে, অমনি প্রথমেই শুরু হলো হিন্দু মালিকদের মিষ্টির দোকানের কাচের শোকেস ভেঙে খাওয়ার ধুম। আর তারপর কাপড়ের দোকানে লুটের পালা। এরা সবাই অশিক্ষিত দীন দরিদ্র কলকাতার বস্তির মুসলমান। দুই দিন পর তারা অবশ্য বুঝতে পারল, কাপড়ে কতটা রক্তের রং লেগেছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রতিরোধ ও প্রতিশোধের আদিম আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল। কলকাতা শহর দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেল। (কামরুল, ২০১০ : ৮৯-৯০)

ইতিহাস সাক্ষ্য প্রমাণসহ আজ যা উপস্থাপন করেছে, ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত *ছোটবড়* গ্রন্থভুক্ত 'স্থানে ও স্তানে' গল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সে সত্যের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়েছেন। একমাত্র অসাধারণ প্রতিভার জোরেই এধরনের কালোত্তীর্ণ মানসের পরিস্ফুটন সম্ভব।

'স্টেশন রোড' গল্পে দেখানো হয় দাঙ্গা উপদ্রুত শহরে একশো চুয়াল্লিশ ধারা অমান্য করে হিন্দু-মুসলমান একীভূত হয়েছে পদ্মলোচনের গানের নৈশ আসরে। প্রশাসনের আপত্তিতে তারা শহরের সীমানায় গানের আসর বসাতে পারে না কেননা তাতে লঙ্ঘিত হয় একশো চুয়াল্লিশ ধারা কিন্তু রেললাইনের অপর পাড়ে 'একশো চুয়াল্লিশ আর সাঁঝবাতি আইন এলাকার একশো গজ দূরে (মানিক, ২০০৫ : ৩২০) গ্রামীণ এলাকায় তারা গানের আসরে সম্মিলিতভাবে অংশগ্রহণ করে। নিতাই, মনোহর, সামসুদ্দীন, নুরুল ধর্ম ও জাতপাতের সীমানা তুলে দিয়ে প্রাণের তাগিদে গানের আসরে স্থান করে নেয় নিজেদের। এ গল্পে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার বিপ্রতীপে হিন্দু-মুসলমান সম্মিলনের এক সুষম চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। গল্পকার এ সত্যকে পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন যে, শাহরিক রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলমান পৃথক পরস্পরকে নিশ্চিহ্ন করার নিমিত্তে দাঙ্গায় সক্রিয়। অন্যদিকে সাধারণ ও প্রান্তিক মানুষ গ্রামীণ বা বাঙালি লোকসংস্কৃতির সামিয়ানার নিচে একত্র প্রাণের টানে, ধর্ম সেখানে তুচ্ছ।

বাঙালি জীবনে দেশভাগ এবং তৎপূর্ব ও পরবর্তী সাম্প্রদায়িক সহিংসতা বা দাঙ্গা বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন গল্প-উপন্যাসে বিম্বিত হয়েছে। কেবল দাঙ্গাকে বিষয় করে রচিত বাংলা

উপন্যাস সংখ্যায় নগণ্য তবে দাঙ্গার উল্লেখযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় শহীদুল্লা কায়সারের *সংশপ্তক* (১৯৬৫), আবু ইসহাকের *সূর্য-দীঘল বাড়ী* (১৯৫৫), প্রফুল্ল রায়ের *কেয়াপাতার নৌকা* (১ম পর্ব ১৩৭৬, ২য় পর্ব ১৩৭৭), অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের *নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে* (১ম খণ্ড ১৯৭১, ২য় খণ্ড ১৯৭২) উপন্যাসে। হিন্দি ভাষায় ভীষ্ম সাহানির *তমস* (১৯৭৫) এবং উর্দু ভাষায় লেখা কৃষণ চন্দরের *গাদ্দার* উপন্যাসেও এ উপমহাদেশে '৪৬-'৪৭ সালে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বর্বরতার নারকীয় ঘটনাসমূহ শিল্পরূপ পেয়েছে। ছোটগল্পের স্বল্পপরিসরেও দাঙ্গার বীভৎসতা সাহিত্যে স্থান পেয়েছে এবং পাঠকদের শিহরিত করেছে। বাংলা, হিন্দি, উর্দু ভাষায় উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত দাঙ্গার বীভৎসতা, মানুষের অন্তর্গূঢ় বেদনা নিরাবেগ তথ্য-ভাষ্যে ঠাঁই পেয়েছে। এ বাংলার ইসহাক চাখারীর 'রায়ট', আবু ইসহাকের 'বনমানুষ', হাসান হাফিজুর রহমানের 'আরো দুটি মৃত্যু', সোমেন চন্দের 'দাঙ্গা', আলাউদ্দিন আল আজাদের 'ছুরি', হাসান আজিজুল হকের 'পরবাসী' প্রভৃতি গল্পে যেমন দাঙ্গার বিবরণ পাওয়া যায়, তেমনি পশ্চিম বাংলার রমেশচন্দ্র সেনের 'সাদা ঘোড়া', সমরেশ বসুর 'আদাব', সলিল চৌধুরীর 'ড্রেসিং টেবিল' প্রভৃতি গল্পেও দাঙ্গা-বিধ্বস্ত জনমানুষের দুঃখগাথা শব্দরূপ পেয়েছে। বাংলা ছাড়াও হিন্দি, উর্দু, পাঞ্জাবি ভাষার ছোটগল্পেও দাঙ্গার নির্মমতা শিল্পরূপ পেয়েছে। হিন্দি ভাষায় যশপাল-এর 'খোদা আর ঈশ্বরের লড়াই', পাঞ্জাবি ভাষায় ভীষ্ম সাহানির 'অমৃতসর এসে গিয়েছে', কুলবন্ত সিং বির্কের 'আগাছা'; উর্দু ভাষায় সাদাত হাসান মান্টোর 'তোবাটেক সিং', খাজা আহমদ আব্বাসের 'প্রতিশোধ', কৃষণ চন্দরের 'পেশোয়ার এক্সপ্রেস' প্রভৃতি গল্প উল্লেখযোগ্য।

উপর্যুক্ত তালিকা আমাদের আশ্বস্ত করে যে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বিশেষত '৪৬ -' ৪৭-এর দাঙ্গার অমানবিকতা উপমহাদেশের সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী মানুষের মতো সাহিত্যিকদের মর্মমূলে তীব্র বেদনার সৃষ্টি করেছিল এবং সংখ্যায় কম হলেও বাংলা ও অন্যান্য উপমহাদেশীয় ভাষার গল্প-উপন্যাসের বিষয় হিসেবে দাঙ্গা উপজীব্য হয়েছে। বাংলা ভাষায় রচিত দাঙ্গা-বিষয়ক উপন্যাস ও ছোটগল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়। প্রথমত, *স্বাধীনতার স্বাদ* বাংলা সাহিত্যের একমাত্র উপন্যাস — যার পটভূমি ও অবলম্বিত বিষয় '৪৬-'৪৭ এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। অন্যান্য বাংলা উপন্যাসে কেবল দাঙ্গার উল্লেখ পাওয়া যায় বা মূল ঘটনার আবর্তনে দাঙ্গা-উদ্ভূত পরিবেশের কিছু বিবরণ বা উৎকণ্ঠা-আশঙ্কায় নিমজ্জিত মানুষের মনোভূমির সন্ধান পাওয়া যায় কিন্তু সমগ্র উপন্যাসে তা ছড়িয়ে পড়ে না বা উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দুতেও অবস্থান করে না। পাঞ্জাবি ও উর্দু ভাষায় রচিত *তমস* ও *গাদ্দার* উপন্যাস দাঙ্গা-কেন্দ্রিক কিন্তু তাতে দাঙ্গার বীভৎসতা, হত্যা-পাশবিকতার রূঢ় মর্মস্পর্শী বর্ণনা প্রাধান্য পেয়েছে। *স্বাধীনতার স্বাদ* উপন্যাসে দাঙ্গার বিবরণ কেবল নয় গভীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় এর কার্যকারণ, দাঙ্গা-উপদ্রুত জনমানুষের জটিল মনস্তত্ত্বসমেত বিশ্লেষিত হয়েছে। এছাড়া দাঙ্গা-বিরোধী শান্তিকামী মানুষের শান্তির লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপের ইতিহাস এ উপন্যাসে যেমনটা পাওয়া যায় তা অন্যভাষার সাহিত্যেও দুর্লভ।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্মীয় ভেদবুদ্ধির উচ্চে মানবতাকে কেবল নয়, শ্রেণি-দ্বন্দ্বকেও স্থান দিয়েছেন। শ্রেণিবিভক্ত সমাজের মানদণ্ডে দাঙ্গাকে স্থাপন করে সুচারু বিশ্লেষণ এবং অমোঘ যুক্তিগ্রাহ্যতায় পাঠককে এ বোধে জারিত করেছেন যে, নিম্নবর্গীয় মানুষেরাই ধর্মীয়

হানাহানির বা সংহিসতার শিকারে পরিণত হয় অথচ উচ্চবর্গীয়রা যারা এ গণ্ডগোলের হোতা তারা নিজেরা থাকে নিরাপদ দূরত্বে। বস্তুত রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও মানবিকতা বোধের প্রখরতায় তাঁর রচনা অন্যান্য দাঙ্গা-বিষয়ক রচনা থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়েছে। মার্কসবাদে বিশ্বাসী এবং কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় কর্মী হিসেবে মানিক যে দৃষ্টিকোণে রাজনীতি এবং যুদ্ধ-মন্বন্তর-দাঙ্গা-বিধ্বস্ত সমকালীন বাংলার সমাজকে প্রত্যক্ষ করেছেন তা অন্য সাহিত্যিকদের পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না। অধিকাংশ সাহিত্যিক সংবেদনশীল শিল্পীমনে মানবতাকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়ে দাঙ্গা-বিরোধী গল্প-উপন্যাস রচনা করেছেন। মানিক এই মানবতাবোধের সঙ্গে যোগ করেছেন রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দেখিয়েছেন শ্রেণি-বিভক্ত সমাজে শ্রেণি-দ্বন্দ্বই মুখ্য হওয়া উচিত, ধর্মীয় নয় অর্থাৎ ধর্মীয় কার্যকারণের বিপ্রতীপে শ্রেণিগত দ্বন্দ্বকে সক্রিয় করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নয়, সমাজ বদলের আহ্বান করেছেন তিনি।

সামাজিক আন্দোলনের একজন একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে বেপরোয়া দুঃসাহসী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দাঙ্গাবিধ্বস্ত এলাকায় শান্তিস্থাপনের উদ্দেশ্যে গঠিত পিস কমিটিতে যোগ দিয়েছেন। সাংসারিক দায়বদ্ধতা, চরম দারিদ্র্য, দুরারোগ্য ব্যাধি এসব তুচ্ছ করে মানিক কেবল দুঃসাহস সম্বল করে উপদ্রুত এলাকা ঘুরে দেখেছেন, একাধিকবার প্রাণ বিপন্ন হলেও স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করে গেছেন নিরলসভাবে। তাঁর ডায়েরিতে বিস্তৃতভাবে জুড়ে থাকে তৎকালে সংঘটিত কলঙ্কিত সাম্প্রদায়িক উপদ্রবের পরিপ্রেক্ষিতে একজন অশান্ত শিল্পীর উদ্বেগ আর উত্তেজনার বিস্তৃত ইতিহাস এবং রাজনৈতিক প্রয়োজনে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধিয়ে মুনাফা অর্জনের ব্যঙ্গচিত্র।

> ...দাঙ্গার সংবাদ শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। দাঙ্গা হাঙ্গামা হবে একরকম জানাই ছিল, তবু মনে হল — কি আপশোষ! কি আপশোষ!
> রাত প্রায় ১০ টায় পার্টির দুটি ছেলে এল। Peace Committee গঠনের চেষ্টা হচ্ছে — সকালে যেতে হবে।... (১৬ অগাস্ট, ১৯৪৬ শুক্রবার)
> সকালে Peace Committee গঠনের জন্য ডাকতে এল না, একটু আশ্চর্য্য হলাম।...
> বিকালে এ অঞ্চলে শান্তি-সভা হবে শুনলাম। খুশী হয়ে নিজে বার হলাম — যতটা পারি সাহায্য করতে। যাকে দেখছি তাকে বলছি — মিটমাটের জন্য সভায় যেতে। মসজিদের কাছে আনোয়ার শা রোডের একদল মুসলিম স্বীকার করলেন মিটমাট দরকার– কয়েকজন উত্তেজিতভাবে বললেন মেরে পুড়িয়ে তারপর এখন মিটমাটের কথা কেন? অন্যেরা তাঁদের থামালেন। ফাঁড়ি পেরিয়ে পুলের নীচে যেতে এল বিরোধিতা — হিন্দুদের কাছ থেকে। কিসের মিটমাট — মুসলমানরা এই করেছে, ওই করেছে! 'ব্যাটা কমিউনিস্ট' বলে আমায় মারে আর কি! প্রায় দেড়শো লোক মিলে ধরেছিল। (১৭ অগাস্ট, ১৯৪৬ শনিবার)
> মিটমাটির চেষ্টা ব্যর্থ হবে, কাল বিকেলের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পেরেছি।... ক'জনকে বক্তৃতা করতে দেওয়ায় মারটা খেলাম না। K.P. Roy Lane দিয়ে বাঁক পর্য্যন্ত এসেছি — লাঠি হাতে এক ছোকরা পথ আটকে দিল — ফের আমায় ভিড় ঘিরে ধরল। এক ছোকরা লাঠি দিয়ে মারে আর কি! — নিজেই ধমক দিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করলাম। ধীর শান্ত আত্মপ্রতিষ্ঠ ভাব না বজায় রাখতে পারলে নিশ্চয় মার খেতাম। 'শালা কম্যুনিস্ট!' 'মুসলমানের দালাল।' রব উঠেছিল চারিদিকে।.. (১৮ অগাস্ট, ১৯৪৬ রবিবার)
>
> (যুগান্তর, ১৯৯০ : ৮৬-৮৯)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দু-মুসলমান কারো পক্ষাবলম্বন করেননি, কারও দোষ-ত্রুটির কথাও বলেন নি; তিনি মানুষের কথা বলেছেন, মানুষের কথা ভেবেছেন এবং তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় বিশ্লিষ্ট করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে তাঁর কথাসাহিত্যের অবলম্বন করেছেন সযত্ন পরিচর্যায়। ইতিহাসের কলঙ্কিত অধ্যায়কে সাহিত্যের আধারে ঠাঁই দিয়ে তিনি মানবতার অবমাননার বহু কৌণিক ও মাত্রিকতাময় চালচিত্র ধারণ করে সাম্প্রদায়িক সহিংসতামুক্ত শ্রেণিহীন এক নির্মল সমাজের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন। বিষয়বস্তু রাজনৈতিক হলেও তাঁর রচনা কেবল শ্লোগানধর্মী হয়ে থাকেনি বরং রূপ নির্মাণে সাফল্য অর্জন করায় মানিক-কথাসাহিত্য বাংলা সাহিত্যে কালোত্তীর্ণ মহিমায় উদ্ভাসিত হয়েছে।

টীকা

১. বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা-এর 'চিরায়ত গ্রন্থমালা'র অন্তর্গত শহীদুল আলম সম্পাদিত, জানুয়ারি ১৯৯৫ সালে প্রথম প্রকাশিত *সেরা কিশোর গল্প : লিও টলস্টয়* গ্রন্থভুক্ত 'শিশুর সরলতা' (রুশ থেকে ইংরেজি ভাষায় অনূদিত গল্পটির নাম : 'Children may be wisen than their elder' গল্পটির ছায়া পাওয়া যায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ছেলেমানুষি' গল্পে।

গ্রন্থপঞ্জি

অমলেন্দু সেনগুপ্ত (১৯৮৯) । *উত্তাল চল্লিশ– অসমাপ্ত বিপ্লব*। পার্ল পাবলিশার্স, কলকাতা।

আখতার হুসেন [সম্পা.] (১৯৯১)। *সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী গল্প*। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা।

কামরুল হাসান (২০১০)। *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলন ও আমার কথা*, সৈয়দ আজিজুল হক [সম্পা.] । প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

গোপিকানাথ রায়চৌধুরী (১৯৯৮)। *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরীতি*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

জয়া চ্যাটার্জী (২০১৪)। *বাঙলা ভাগ হল*। দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

নিতাই বসু (১৯৮৬)। *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজ জিজ্ঞাসা*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

বিপ্লব মাজী [সম্পা.] (২০১২)। *বাংলা উপন্যাস ২০০ বছর*। অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা।

বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০০৯)। *বাংলাদেশের সাহিত্য*। আজকাল, ঢাকা।

ভূইয়া ইকবাল (সম্পা.) (২০০১)। *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (২০০৫)। *মানিক রচনাবলি* ষষ্ঠ খণ্ড। ঐতিহ্য, ঢাকা।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (২০০৫ক)। *মানিক রচনাবলি* সপ্তম খণ্ড। ঐতিহ্য, ঢাকা।

যুগান্তর চক্রবর্তী [সম্পা.] (১৯৯০)। *অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : ডায়েরি ও চিঠিপত্র*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

শিখা ঘোষ (১৯৯০)। *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : অবয়বগত বিশ্লেষণ*। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা.লি., কলকাতা।

সৈয়দ আজিজুল হক (১৯৯৮)। *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণ* । বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ [সম্পা.] (২০০৮)। *উত্তরাধিকার*। ৩৬ বর্ষ ৩য় সংখ্যা ॥ জুলাই-সেপ্টেম্বর। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

সোমেন চন্দ (২০১৩)। *সোমেন চন্দ রচনাবলি*, বিশ্বজিৎ ঘোষ [সম্পা.]। কথাপ্রকাশ, ঢাকা।